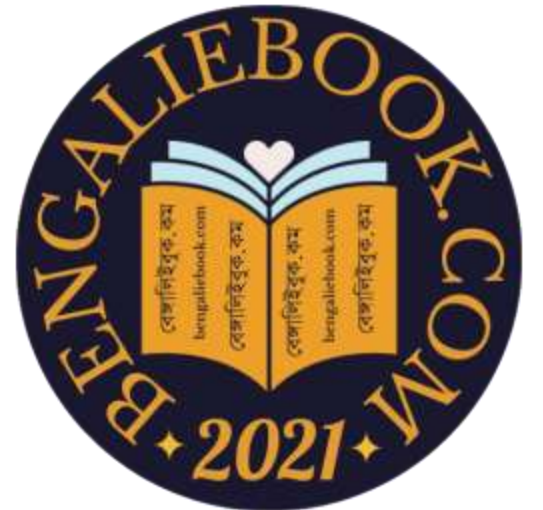


অজ্ঞাত রচনা

একটি অসমাপ্ত গল্প

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



একটি অসমাপ্ত গল্প

আচ্ছা, জ্যাঠামশাই?

কেন মা? বলিয়া গোবিন্দ মুখুয্যে ভাগবত হইতে মুখ তুলিয়া পরম স্নেহে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর দিকে চাহিলেন।

সুরমার দুই চোখে জল টলটল করিতেছিল। হাত দিয়া একগোছা কালো চুল মুখের উপর হইতে পিঠের দিকে সরাইয়া দিয়া মহা অভিমান ভরে অভিযোগ করিল,—আচ্ছা, সাহেবরা যদি এতই পারে তবে কেন তারা দাঁড়কাকগুলো সব মেরে ফেলে না? বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

গোবিন্দ ব্যাপার বুঝিয়া সুরমাকে কাছে টানিয়া লইয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দিলেন। বাটীর ভিতরে তাঁহার স্ত্রী দুরারোগ্য পীড়ায় শয্যাগত,—মরণাপন্ন। এবং এইমাত্র চিলের ছাদে বসিয়া একটা দাঁড়কাক অতি কৰ্কশ কণ্ঠে খাখা করিয়া চীৎকার করিতেছিল।

সেটাকে তাড়াইয়া দিয়া সুরমা অত্যন্ত বিরক্ত ও ভীত হইয়া জ্যাঠামশায়ের কাছে জানিতে আসিয়াছিল—কি জন্য সরকার বাহাদুর এত ক্ষমতামশালী হইয়াও এই ভীষণ অত্যাচার নিবারণ করিতে পারিতেছেন না।

খানিক পরে গোবিন্দ একটুখানি শুষ্ক মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, সাহেবদের কথা ত জানিনে মা, কিন্তু দাঁড়কাকের অপরাধটা কি শুনি?

সুরমা তখন চোখের জল মুছিয়া ফিসফিস করিয়া অনেক নালিশ করিল। কহিল, ইহারাই যমরাজের গুপ্তচর, এবং তাহার অকাট্য প্রমাণ এই যে, দাঁড়কাক হইয়াও ইহাদের গলা ময়ূরের মত চিকচিক করে। ছাদে কিংবা নিকটবর্তী কোন বৃক্ষশাখায় বসিয়া আয়-

আয়-খাখা করিয়া ইহারা বাটীতে যমদূত ডাকিয়া আনে। বউদিদি বলিয়াছেন, কাহারও ছাদে বসিয়া ডাকিলে আর রক্ষা নাই,—সে বাটীর কেহ-না-কেহ নিশ্চিত মরে। বলিতে বলিতে সুরমা সহসা জ্যাঠামশায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বাপ-মা নাই, কবে মরিয়াছেন জানেও না। জ্যাঠাইমাই মানুষ করিয়াছেন। সেই স্নেহময়ী আজ সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল রোগশয্যায় পড়িয়া। আজ তাঁহারই মরণ কামনা করিয়া ওই ঘণিত পক্ষীটা যখন বারংবার ডাকিয়া গিয়াছে, তখন কি উপায়ে কেমন করিয়া তাঁহাকে আর মৃত্যুর অনিবার্য কবল হইতে রক্ষা করা যাইবে! উপায় না পাইয়া যখন সে বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন এই উপায়বিহীনাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া আর এক নিরুপায়ের চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

রাত্রে আহা করিতে বসিয়া গোবিন্দ বধূকে ডাকিয়া মৃদু অনুযোগের স্বরে বলিলেন, ছি মা, ও মেয়েটার জ্যাঠাইমা-অন্ত প্রাণ, তাকে কি এমন করে ব্যাকুল করে দিতে আছে?

এই বধূটি অত্যন্ত মুখরা। এখন শব্বরের সুমুখে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু তিনি আঁচাইতে বসিয়া স্পষ্ট শুনিতে পাইলেন, বধূ অস্ফুট দ্রুত বিড় বিড় করিতেছে—ইস কচি খুকি কিনা, তাই ভয় দেখিয়ে ব্যাকুল করে দিয়েচি! এগারো-বারো বছরের মেয়ে হল, ও নিজেই ত সব জানে! আজকাল রাত্তির হলে বাড়িসুদ্ধ লোকের ভয়ে গা ছমছম করে, বজ্জাত মেয়ে আবার তাই কিনা লাগিয়ে এসেচে।

গোবিন্দ বসিয়া সমস্তটা শুনিলেন, কিন্তু একটি কথাও না কহিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

তাহার পর হইতে সুরমা না খাইয়া, না শুইয়া কাঁদিয়া কাটিয়া মাথা খুঁড়িয়া কি কাণ্ডই না করিয়া বেড়াইল। কিন্তু, মরণের দিনটিতে এমনি আশ্চর্য শান্ত হইয়া গেল যে, পাড়ার লোকেরা পর্যন্ত বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেল। মা-কে দেখিতে দুই মেয়ে এবং জামাইরা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সকলের সুমুখে তিনি সুরমাকে স্বামীর হাতে-হাতে সঁপিয়া

দিয়া বলিলেন, এটি আমার সকলের ছোট সন্তান। এর যেন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অযত্ন না হয়। আর আমার গায়ের সমস্ত গহনা একে দিয়ে গেলুম।

তাঁহার অনেক টাকার অনেক রকমের অলঙ্কার ছিল—সুতরাং পুত্রবধূ এবং মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল।

বহুদিন হইতে ভুগিয়া ভুগিয়া তিনি একটু একটু করিয়া মরিতে ছিলেন, সেই জন্য শেষ সময়টিতেও জ্ঞান ছিল, সুরমাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া কানে কানে বলিলেন, সুরো, তোর বুড়ো জ্যাঠামশাইকে দেখিস মা,—তুই ছাড়া ওঁর আর কেউ রইল না। ওঁকে তোর ভরসায় রেখেই আমি নির্ভাবনায় যাচ্ছি।

মেয়েরা এই কানে কানে কথাটা শুনিতে না পাইয়া মনে মনে আরও দ্রুত ও বিরক্ত হইয়া অনুমান করিল, তিনি নিশ্চয়ই গোপনে তাঁহার সন্ধিতে টাকাকড়ির সন্ধান বলিয়া দিয়া গেলেন।

জ্যাঠাইমা পরলোকে চলিয়া গেলেন। শুধু সেই দিনটি মাত্র সুরমা হতজ্ঞানের মত স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়া রহিল। কেমন করিয়া সেদিন সে রাত্রি কাটিল, তাহা সে ঠাহর পাইল না। কিন্তু পরদিন আপনা-আপনিই সুস্থির সুদৃঢ় হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার চোখে-মুখে বিহ্বলতার লেশমাত্র রহিল না। প্রচণ্ড ভূমিকম্প যেমন মুহূর্তের আলোড়নে সমুদ্রতলদেশকে পাহাড়ের চূড়ায় ঠেলিয়া তুলিয়া দিয়া যায়, জ্যাঠাইমার মৃত্যু তেমনি এই একটি দিনের নিদারুণ ধাক্কায় বালিকা সুরমাকে একেবারে প্রবীণতার সীমায় পৌঁছাইয়া দিয়া দু-দিনের আড়ালে পড়িয়া গেল।

শোকাচ্ছন্ন গোবিন্দ মুখুয্যে ঘাড় গুঁজিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া ছিলেন, সুরমা নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া তাঁহার কেশবিরল মাথাটিতে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে প্রশ্ন করিল, জ্যাঠামশাই?

কেন মা?

জ্যাঠাইমা এতক্ষণ আমার মায়ের সঙ্গে বসে কত গল্প কচ্ছেন না?

গোবিন্দ হঠাৎ প্রশ্নটা বুঝিতে না পারিয়া মুখপানে চাহিয়া রহিলেন।

সুরমা কহিল, জ্যাঠাইমা বলতেন, সবাই স্বর্গে গেলে আবার দেখা হয়। আচ্ছা, আমার ত মাকে মনে পড়ে না, আমি কেমন করে চিনে নেব?

গোবিন্দ আগ্রহভরে উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ সুরমা, তোর জ্যাঠাইমা বুঝি এই সব বলতেন? আচ্ছা, তোদের দুজনের কি কি কথা হত আমাকে সব খুলে বল ত মা।

তখন সুরমা একটি একটি করিয়া স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল। তিনি সুদীর্ঘ রোগশয্যায় শুইয়া জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া কতদিন কত উপলক্ষে কত কথাই না এই মেয়েটিকে বলিয়াছিলেন। মরণের পর সুস্থ সবল দেহের কথা, পুনরায় দেখা-সাক্ষাতের কথা।

হাঁরে সুরো?

কেশব লাহিড়ী মাইনার ইন্সকুলের হেডমাস্টার, বেতন ত্রিশ টাকা। এই গ্রামখানিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সদরওয়ালা, বড় চাকুরে, জমিদার প্রভৃতি অনেক বড়লোকের বাস, তথাপি লাহিড়ীমশায়ের ন্যায় সম্মানিত ব্যক্তি বোধ করি আর কেহই ছিলেন না। এ সম্মান তাঁহার নিজের অর্জিত এবং একেবারে নিজস্ব। সেই জন্যই মনে হয় ছোট, বড়, ইতর, ভদ্র সবাই মান্য করিয়া চলিত।

আজ রবিবার, স্কুল ছিল না। অপরাহ্নবেলায় তিনি বাহিরের উঠানে চাঁপাতলায় একখানি চৌকি পাতিয়া নিবিষ্টচিত্তে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেছিলেন। চোখের

কোণ বাহিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তাহাই মুছিবার জন্য ক্ষণকালের নিমিত্ত চশমাখানি নামাইয়া ধরিয়া চোখ মুছিতেছিলেন, হঠাৎ পিছন হইতে ডাক আসিল, ‘জ্যাঠামশাই?’

‘কেন মা?’

কমলা তাঁহার বড় আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বয়স দশ বৎসর। কাছে আসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ‘আচ্ছা, জ্যাঠামশাই, সাহেবরা ত এত পারে, তবে কেন দাঁড়কাকগুলোকে সব মেরে ফেলে না?’ কমলার অদ্ভুত প্রশ্নে কেশব হাসিলেন। বলিলেন, ‘সে খবর ত জানিনে মা। কিন্তু দাঁড়কাকগুলোর অপরাধ?’

কমলা অতিশয় গম্ভীর হইয়া বলিল, ‘বাঃ,—ওরা যে যমের বাহন, জ্যাঠামশাই। চিলেরা ছাতে বসে ডেকে ডেকে বাড়ি চিনিয়ে দেয়, তাই ত যমের দূত চিনতে পারে। নইলে কেউ ত মরত না, সবাই কেমন মজা করে বেঁচে থাকত, না জ্যাঠামশাই?’

কেশব হাসিতে লাগিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘এ খবরটি কে তোমাকে দিলে মা?’

‘বউদি। সত্যি, না?’

কেশব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, ‘তোমার বউদির কথা হয়ত সত্যি নয় মা।’

কমলা আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিল, ‘সত্যি নয়?’ পরক্ষণেই একগোছা চুল কপালের একাংশ হইতে সরাইয়া দিয়া বার-দুই গ্রীবা আন্দোলিত করিয়া বলিল, ‘না জ্যাঠামশাই, সত্যি। নইলে ওরা ত দাঁড়কাক, তবে কেন ওদের ময়ূরের মত গলা চিকচিক করে?’

কেশব প্রথমে উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন, তারপর যথাসাধ্য গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ‘কিন্তু মা, তোমার কালো পায়রাগুলোরও ত গলা চিকচিক করে।’

কমলা বলিল, ‘তা করলেই বা। তারা যে পায়রা, লক্ষ্মীর বাহন, আর এরা যে দাঁড়কাক।’

কেশব ক্ষণকাল হাসিমুখে নিরন্তর থাকিয়া বলিলেন, ‘তবুও, আমার বিশ্বাস হয় না মা।’

কমলা ক্ষুণ্ণ হইল। মুখখানি অপ্রসন্ন করিয়া সেইখানে হাঁটু গড়িয়া বসিয়া জ্যাঠামশায়ের জানুর উপর হাতের ভর দিয়া মুখ তুলিয়া বলিল, ‘কেন বিশ্বাস হয় না তোমার?’

কেশব বলিলেন, ‘আরো অনেক পাখির গলা চিকচিক করে মা, সেইজন্যই হয় না।’

কমলা কিছুক্ষণ স্থির হইয়া চিন্তা করিয়া অবিশ্বাসের স্বরে বলিল, ‘তা করুক জ্যাঠামশাই, কিন্তু, তারা ডাকবার সময় অমন ন্যাজ নিচু করে না—এরা ন্যাজ নিচু করে।’

কেশব বলিলেন, ‘ফিঙে পাখিও ন্যাজ নিচু করে।’

‘করে? কিন্তু, তাও যদি করে, তারা ত ছাতে বসে বাড়ি চিনিয়ে দেয় না। আর তারা ডাকলে ভয় করে না, কিন্তু এরা ডাকলে যে ভয় করে! আচ্ছা, তোমার করে না?’

কেশব এ অকাট্য যুক্তি আর খণ্ডন করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ‘করে বৈ কি মা, আমারও ভয় করে।’

কমলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, ‘আমার বড্ড করে। আচ্ছা, জ্যাঠাইমা আমার ভাল হয়ে উঠচেন না কেন? একটা দাঁড়কাক কালও ডেকেচে। আজও একবার সকালে ডেকেচে—তাই, বৌদি বলছিলেন’—বলিয়াই সে সহসা থামিয়া গেল। এতক্ষণে কেশব বুঝিলেন, কেন কমলা দাঁড়কাকের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে আসিয়াছে।

তাঁহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী প্রায় এক বৎসর হইতে পীড়িত হইয়া আছেন, কিছুতেই আরোগ্য হইতে পারিতেছিলেন না। বরং মাস-খানেক হইতে আরও যেন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কাল সমস্ত দিন শয্যা ত্যাগ করিতেও পারেন নাই। ছয় বৎসর পূর্বে সিদ্ধেশ্বরীর ছোটছেলের মৃত্যু হয়। তখন হইতেই তাঁহার দেহ ধীরে ধীরে ভাঙ্গিতেছিল। এই পাঁচ বৎসর ভাল-মন্দে কোনমতে কাটাইয়া গত বৎসর হইতে রীতিমত পীড়িত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। কেশব যথাসাধ্য চিকিৎসার দ্রুতি করেন নাই, কিন্তু ফল হয় নাই। তাই ইদানীং তাঁহার আশঙ্কা হইতেছিল, বুঝিবা, সত্যই তাঁহার পরকালের ডাক পড়িয়াছে। এখন কমলার কথায় তাঁহার চোখ-দুটি ছলছল করিয়া উঠিল। কমলা তাহা লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার জানুদ্বয়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল। কেশব জামার হাতায় চোখ মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায় আস্তে আস্তে বলিলেন,—‘কাঁদিস নে মা, ভাল হয়ে যাবে।’

কমলা মুখ না তুলিয়াই প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ‘তবে, কেন ওরা অমন করে বলে?’

‘কে কি বলে মা?’

কমলা তেমনি করিয়াই জবাব দিল, ‘মা আর বৌদি। তারা ফিসফিস করে কি বলছিল—আমি যেতেই চুপ করলে, আমাকে শুনতে দিলে না।’

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

। একটি অসমাপ্ত গল্প ।

অজ্ঞাত রচনা